পাঁজরে শুনি দাঁড়ের শব্দ

শঙ্খ ঘোষের কবিতা

সঞ্জীব দাস

পুনশ্চ

কথাচ্ছলে

কবিতা নিয়ে চর্চা করছি সেই ছাত্র জীবন থেকে। সেই সূত্রে ছোট-বড় নানা কবির সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁদের অনেকেই আজ ইহ জগতে নেই। আজ পড়ন্ত যৌবনে একাকী যাপনের ধূসর মূহূর্তে তাঁদের মুখগুলো মনে পড়ে আর নীল বেদনার স্রোত কখন যেন অশ্রু হয়ে নামে।

২০০১ সাল। আমি তখন এম এ পাশ করে একটি স্কুলে সদ্য চাকুরি পেয়েছি। স্বাধীনতা পরবর্তী কবিদের নিয়ে একটি সংকলন করার ইচ্ছে হল। পত্রিকাও একটি প্রকাশ করলাম। সেই সূত্রে অনেক কবি, লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ হল। পরিচয় হল কবি প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। চমৎকার মানুষ। উনি রাণাদা, মানে রাণা চট্টোপাধ্যায়ের নাম্বার দিলেন। ফোন করতে রাণা চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'নন্দনে চলে এসো। জমিয়ে আড্ডা হবে।' যথারীতি গেলাম। তখন সেখানে লিটিল ম্যাগাজিন মেলা চলছিল। রাণাদা সেখানে পরিচয় করলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অনন্ত দাশ প্রমুখের সঙ্গে। শুরু হল কবিতার সমুদ্রে অবগাহন।

তবে আমার সাহিত্য সমালোচনার জগতে প্রথম আসা অবশ্য কথাসাহিত্যকে আশ্রয় করে। অধ্যাপক বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য সন্তানস্নেহে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন পরিচয় পত্রিকার দপ্তরে। বলেছিলেন, 'কথাসাহিত্য নিয়ে কাজ কর। প্রবন্ধ লেখ'। স্যারের নির্দেশ মতো তেমনটাই চলছিল। কিন্তু কবিতা সমালোচনায় আমি যেন আবিষ্কারের আনন্দ পাই। তাই ক্রমশই আরও বেশি করে কবিতার মুখোমুখি হতে থাকি। অধ্যাপক সুমিতা চক্রবর্তী এব্যাপারে আমার পথপ্রদর্শক। তিনি হাতে ধরে আমাকে লিখতে শিখিয়েছেন। এছাড়া বলতে হয় উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এবং পবিত্র সরকারের কথা। তাঁদের লেখা পড়েই তো শিখেছি নিরাসক্ত সমালোচনা কীভাবে লিখতে হয়। কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে নিয়ে ইতিমধ্যে 'পারুল বই' থেকে আমার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সেই বইটা পড়ে বিশ্ববন্ধুবাবু খুবই খুশি হন। একদিন বাড়িতে গেছি। নানা কথার পর তিনি বলে ওঠেন, অলোককে নিয়ে তো হল। আর কোনও কবিকে নিয়ে যদি কাজ করতে হয় তবে শঙ্খদাকে নিয়ে একটা কাজ করতে পারিস। তুই পারবি।' প্রথমে ওনাকে সঙ্গে নিয়ে শঙ্খ ঘোষের উপর একটি সংকলনের উদ্যোগ নিই। কিন্তু নানা কারণে সেদিনের সেই প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি। তবে যে স্বপ্ন স্যার সেদিন বুনে দিয়েছিলেন আমার ভিতরে সেই স্বপ্ন কিন্তু জীবিতবান থাকল। সেই স্বপ্ন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকল আমায় নিরন্তর।

সেই স্বপ্নের তাগিদই আমাকে পুনরায় লেখনী ধারণ করাল। তারপর দীর্ঘ তিন বৎসরের প্রচেষ্টায় তৈরি হল শঙ্খ ঘোষের কবিতা নিয়ে আমার পাণ্ডুলিপি। সেই পাণ্ডুলিপি আজ পুনশ্চ থেকে বই হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায়। অধ্যাপিকা জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় আমাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। এর জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এব্যাপারে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ আমার পাথেয়। অধ্যাপক পিনাকেশ সরকার, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক মানস মজুমদার-এই ত্রয়ী পিতৃতুল্য অধ্যাপকের অনুপ্রেরণাও কী ভুলবার! রবীনবাবু আমার গবেষণা নির্দেশক ছিলেন। তিনি এই বইটি প্রকাশের বিষয়ে খুবই উৎসাহী ছিলেন। সে-ই তিনিও আর নেই। করোনার নির্দয় থাবা তাঁকেও কেড়ে নিল। আমি আবারও যেন স্বজনহারা হলাম।

তবে শুধুই কি শিক্ষক-শিক্ষিকা, শুভাকাঙ্খীদের তাড়না আমাকে দিয়ে এই বইটা লিখিয়ে নিল? না, তা নয়। আসলে সেই ছাত্র জীবন থেকেই তো শঙ্খ ঘোষ ও তাঁর কবিতা ছিল আমার আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। সেই কবে 'যমুনাবতী' কবিতাটি তার ছন্দ ও ধ্বনিস্পন্দের সুমিত হিল্লোলে, প্রতিবাদের তীক্ষ্ণতায় আমার মনকে দ্রবীভূত করেছিল। এরই মধ্যে অনুষ্টুপ থেকে প্রকাশিত হল যুগান্তকারী বই 'কবিতার মুহূর্ত'। সেখান কবিতাটির প্রেক্ষাপট সবিস্তারে বর্ণিত। জানা গেল কুচবিহারে খাদ্য আন্দোলনের মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে একজন বালিকার মৃত্যু হয়। খবরের কাগজে এই ঘটনার বিবরণ পড়ে শঙ্খ ঘোষ স্তম্ভিত হন। তাঁর বেদনাখিন্ন মন ভাবে' 'স্বাধীন দেশের স্বাধীন পুলিশের হাতে স্বাধীন এক কিশোরীর কত অনায়াস সেই মৃত্যু'! তারপর মাসখানেক অতিবাহিত হয়েছে। তখন কবির পরিবার কলেজ স্ট্রিট বাজারের পিছনের গলিতে থাকত।একদিন জানালা দিয়ে নিচের গলির দিকে তিনি তাকিয়ে দেখেন রুটিসেঁকা আয়োজনে দোকানি আঁচ তুলছে উনুনে, আর ময়লাছেঁড়া পোশাকে কয়েকটি ছেলেমেয়ে মাদ্রাসায় পড়ছে। বারান্দার পিছনের ঘর থেকে ভেসে আসছে তাঁর ছোটোবোনের ছড়া আওড়ানোর শব্দ। তখন খেতে আসার জন্য মায়ের ডাক শুনে এক দমকায় তাঁর মনে পড়ল সেই খুন হয়ে যাওয়া মেয়েটি এবং তার হতভাগিনী মায়ের মুখচ্ছবি। তাঁর মনের অতলে জাগে আলোড়ন। সেই আলোড়ন থেকেই জন্ম নিল 'যমুনাবতী'।

কবির জবানিতে কবিতাটির এই আলম্বন বিভাবের কথা জেনে আমি স্পেনীয় সেই রসিকের মতো যেন বলে উঠেছিলাম : 'El gran poeta, estoy inmerso contigo por tu arrebato de tu humanidad.' আমি আসলে মানসিকতায় খানিকটা অশোক মিত্রপন্থী। যে কবির মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা আছে, যাঁর সৃষ্টির শরীরে আঁকা হয়ে থাকে মানবিকতাবোধের আন্তরিক স্বাক্ষর তাঁকে আমি ভালোবেসে ফেলি হৃদয় দিয়ে। তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার প্রিয় কবি। একই কারণে জীবনানন্দ, নীরেন্দ্রনাথ, অলোকরঞ্জন, মণিভূষণের কবিতা আমার আশ্রয়। এই একই কারণে শঙ্খ ঘোষের কবিতা আমাকে জারিত করে। আর এই ভালোবাসা থেকেই একদিন অলোকরঞ্জনকে নিয়ে একটি বই লিখেছিলাম। আর সেই ভালোবাসাই আমাকে দিয়ে এই বইটি লিখিয়ে নিল।

আর একটি কারণেও শঙ্খ ঘোষ আমার প্রিয়। তা হল তাঁর ক্ষমতার বিপরীতে চলার নির্ভীক এষণা। যখনই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মনুষ্যত্বকে পিষে মারতে চেয়েছে, যখনই মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে অন্ধশক্তি মত্ততায় গ্রস্ত করতে উদ্যত হয়েছে তখনই তাঁর শানিত লেখনী প্রতিবাদে উদ্যত হয়ে উঠেছে। জরুরি অবস্থার দিনগুলোতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লিখেছেন 'রাধাচূড়া'র মতো বজ্রগর্ভ কবিতা। আবার বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতার তুঙ্গে তখনও তিনি তাঁদের একাংশের দম্ভ, তাঁদের শ্বাসরোধকারী দলতন্ত্রকে বিঁধেছেন স্পষ্ট স্বরে। রচিত হয়েছে 'লাইনেই ছিলাম বাবা'র মতো কাব্যগ্রন্থ। জন্ম নিয়েছে 'বেলেঘাটার গলি', 'ন্যায়-অন্যায় জানিনে', 'তুমি কোন দলে'র মতো শানিত বক্রোক্তির তীক্ষ্ণ কবিতা। 'পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ'—এই পঙক্তি তো আজ প্রবাদ বাক্যের মর্যাদা পেয়েছে। ক্ষমতার মুখোশ এমন তীব্রতায় ছিঁড়ে ফেলতে ক'জন পেরেছে! তারপর সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের জমি আন্দোলনের অগ্নিপ্রহরে তিনি পথে নেমেছেন। লিখেছেন 'স-বিনয় নিবেদন'। তারপরে নতুন সরকার এসেছে। অনেকেই ভেবেছিল অন্য অনেকের মতো শঙ্খবাবুও বোধ হয় সরকারপন্থী হয়ে যাবেন। কিন্তু শঙ্খ ঘোষকে আসলে তাঁরা চিনতে ভুল করেছিলেন। তাঁর ক্ষমতার বিপ্রতীপে চলার প্রবণতা এবারও থাকল অব্যাহত। সরকারি দলের নেতাদের ক্ষমতা মদমত্ততাকে বিঁধলেন একান্ত দ্বিধাহীনতায়। রচিত হল 'মুক্ত গণতন্ত্র'। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন স্বধর্মে আস্থাবান। আমি নিজেও ক্ষমতাকে ঘৃণা করি। তাই শঙ্খ ঘোষ ও তাঁর কবিতা আমাকে টানবে তাতে আর আশ্চর্য কী!

তবে কবিতার বিচারে, কবিপ্রতিভার বিচারে এসবের কি সত্যই কোনও মূল্য আছে? না নেই। কবির জীবনদর্শন আর আমার জীবনদৃষ্টি মিলে গেল এবং এইজন্য তিনি বড়ো কবি, ভালোকবি এমন বিচার অন্ধের হস্তিদর্শন ছাড়া আর কী! একটি প্রতিবেদন কবিতা হয়ে ওঠে তার বক্তব্য বিষয়ের জন্য নয়, তার উপস্থাপনকৌশল বা শৈলীর জন্য। আমি তাই ব্যক্তিগত ভালোলাগা-মন্দলাগাকে দূরে ঠেলে নিরাসক্তভাবে শঙ্খ ঘোষের কবিতার শৈলীকে বোঝার চেষ্টা করেছি। তাঁর অনুভব, বক্তব্য কবিতা হয়ে উঠল কিনা এবং কবিতা হলে তা কীভাবে হয়ে উঠল তা বিশ্লেষণ করে দেখার দিকেই ছিল আমার আন্তরিক প্রয়াস। কতটা পেরেছি তা বিচারের ভার রসজ্ঞ, শিক্ষিত এবং দীক্ষিত পাঠকের উপর ছাড়া হল।

আমার এই গ্রন্থ রচনার কার্যে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি তাঁদের অন্যতম কবিভ্রাতা অধ্যাপক অভ্র ঘোষ। শঙ্খবাবুর সঙ্গে আমার মুখোমুখি পরিচয় ছিল না। তিনি সেই সুযোগ করে দেন। তাঁর বদান্যতাতেই আমার কবির সল্টলেকের বিদ্যাসাগর আবাসনে প্রথমবার যাওয়ার সৌভাগ্য হয়। বৃহৎ অর্থে তিনিও আমার শিক্ষক। এই গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর উৎসাহও আমাকে প্রাণিত করেছে। আধুনিক কবিতার উপর রচিত অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, পবিত্র সরকার, সুমিতা চক্রবর্তী, হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের রচনা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়া সত্যই যদি আর কারো কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হয় তবে তিনি বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক

অধ্যাপক রণজিৎ গুহ। তাঁর রচিত 'তিন আমির কথা' বাস্তবিকই বাংলা কাব্যসমালোচনার ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন। এই বইটি বাংলা কবিতা সমালোচনার অচলায়তনে এনেছে নতুন আলো। সেই আলোর প্রভাব এই বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে।

আমার এই বইটি প্রকাশের ভার সানন্দে গ্রহণ করেছেন পুনশ্চ প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রী সন্দীপ নায়ক। এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সন্দীপদার সঙ্গে আমার সেতুবন্ধনের কাজটি করেছে আমার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অকৃত্রিম বন্ধু, অসামান্য মেধাবী সুশান্ত পাল। তাকে জানাই আমার অকৃত্রিম ভালোবাসা। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাবিভাগের সহকারী অধ্যাপক শশাঙ্ক মণ্ডল আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী। এই গ্রন্থ রচনায় তার উৎসাহ আমার পাথেয়। আর যাঁর কথা বলতেই হবে তিনি আমার স্ত্রী শ্রীমতী সঞ্চিতা দাস (অধিকারী)। আমাকে দৈনন্দিনতার দায় থেকে সে আমাকে মুক্ত রেখেছে বলেই তো আমি সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মগ্ন থাকতে পেরেছি।

কথাচ্ছলে অনেক কথাই বলা হল। পরিশেষে বলি আমি একাডেমিক এবং নন-একাডেমিক সমালোচনার কৃত্রিম ব্যবধানকে এই গ্রন্থে মুছে ফেলতে চেয়েছি। আসলে আমাদের দেশে একধরনের আঁতেলেকচুয়াল এমন ধারণার জন্ম দিয়েছেন —বিদ্যায়তনিক পরিসরের বিশেষজ্ঞরা যা লেখেন (বিশেষত তা যদি হয় গবেষণাপত্র) তা সাহিত্যগুণ বর্জিত। এর মূলে শিক্ষাজীবীদের একাংশের অন্তঃসারশূন্যতাও অবশ্য কম দায়ী নয়। কিন্তু এই স্নবিশদের কে বোঝাবে সাহিত্য সমালোচনা খেয়াল খুশির দৌড় নয়। ম্যাগাজিনে দুকলম বাগাড়ম্বর মানে সমালোচনা নয়। এরজন্য প্রথাগত শিক্ষা প্রয়োজন। বিদেশে কিন্তু এমন ভেদাভেদ পাত্তা পায় না। সেখানে গুণমান বিচার্য, অন্যকিছু নয়। আমি তাই স্নবিশতাকে পরিহার করে সাহিত্য সমালোচনার বিজ্ঞানসম্মত পথ অনুসরণ করেছি। পুরোনো কথার উচ্চারণ নয়, আমি নতুন কথা বলতে চেয়েছি। এবং পেরেছিও। ইতালিয়ান লেখক উমবের্তো একো 'II nome della rosa', উপন্যাসে বলেছেন :

I libri non sono fatti per credercl, ma per essere sottoposti a indagine. Di fronte a un libro non dobbiamo chiederci cosa dica ma cosa vuole dire. আমি একোর এই আর্ষ উক্তিকে পাথেয় করে এই গ্রন্থ রচনায় এগিয়েছি। আশা করি ভবিষ্যতে আমার এই বইটি শঙ্খ ঘোষের কবিতা সমালোচনায় আকরগ্রন্থের মর্যাদা পাবে।

সঞ্জীব দাস
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

রাজাবাগান (লো-ল্যান্ড)
বৈদ্যবাটী, হুগলী
মুঠোফোন : ৭২৭৮৪৪০১৪৩

সূচিপত্র

একটি অলীক সংলাপ ১৩
'নদীর স্রোতের মতো আমার জীবন' ২২
সময়ের স্বরায়ণ ৩৮
এক 'রোমান্টিকের যন্ত্রণাসম্ভব আত্মানুসন্ধান' ৪৮
ক্ষমতার বিপ্রতীপে ৫৬
দুই 'আমি'র সংলাপ ৬৩
সত্তার নির্মাণ : কবিতার শরীর ৭৫
মিথের মুখোশে সময়ের স্বর ৮০
কাব্যভাবনা ৯৩
শৈলীবিজ্ঞানের আলোয় ১০৩
শব্দ দিয়ে নিঃশব্দকে ধরি ১০৯
শঙ্খ ঘোষের কবিপ্রতিভা : ভাঙতে ভাঙতে গড়া ১১৫

নির্বাচিত কবিতা : পাঠ-প্রতিক্রিয়া

'দিনগুলি রাতগুলি' : ফিরে দেখি সূর্য, তোমার প্রথম অভ্যুদয় ১৭১
যমুনাবতী : 'নিভন্ত এই চুল্লিতে মা....' ১৭৮
বুড়িরা জটলা করে : 'রাত্রির কুণ্ডলীও / কুয়াশায় কাঁপে' ১৮২
রাঙামামিমার গৃহত্যাগ : 'ভেজা পায়ে চলে গেল' ১৮৫
পুনর্বাসন : 'ভাঙা বাক্স পড়ে থাকে আমগাছের ছায়ায়' ১৮৭
জাবাল ও সত্যকাম : 'আমার আড়াল বনবাস' ১৯০
যাদব : 'যে-কোনো সবুজ ঘাস / হাতে নিলে হয়ে ওঠে ...' ১৯৬
দেশহীন : 'আজ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই' ১৯৯
তিমির বিষয়ে দু-টুকরো : 'ওকি কৃষ্ণচূড়া?' ২০২
মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয় : 'চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব' ২০৫

বাবরের প্রার্থনা : 'আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক' ২০৮
ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ : 'চুরমার ফেটে যায় মেঘ' ২১৬
রাধাচূড়া : 'এতটুকু টবে এতটা গাছ' ২১৯
আপাতত শান্তিকল্যাণ : 'পেটের কাছে উঁচিয়ে আছো ছুরি' ২২৩
অন্ধ : 'ছোবল নিয়ে সে ঢুকেছে গহনে গহনে' ২২৭
হেতালের লাঠি : 'আমি স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্ন দেখি' ২৩০
দেশ আমাদের আজও কোনো : 'কণ্ঠহীন সমবেত স্বর ...' ২৩৬
অন্ধবিলাপ : 'অধর্ম? কে ধর্ম মানে?' ২৪০
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি : 'আমাদের ডান পাশে ধ্বস' ২৪৪
বিস্ফোরণ : 'সে-ই ইজের পরা মেয়েটি' ২৪৯
শঙ্খ ঘোষ : জীবনপঞ্জি ২৫৩
গ্রন্থপঞ্জি : শঙ্খ ঘোষ ২৫৪
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ২৫৬
নির্দেশিকা ২৫৮

একটি অলীক সংলাপ

(আধুনিক বাংলা কবিতার অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব শঙ্খ ঘোষ করোনা-কবলিত হয়ে বিদায় নিলেন। তিনি বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। তাঁর কবিপ্রতিভার আলোচনা, বিশ্লেষণ বহু হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। আমরা এখন শোকের ভার লাঘব করতে পরলোকে বিশ্বাস স্থাপন করে ফিরে যাব স্বর্গোদ্যানে যেখানে তিনি তাঁর সতীর্থ, গুণমুগ্ধ কয়েকজনের দেখা পেয়ে সংলাপে মগ্ন হয়েছেন। চলুন, আমরা চুপ থেকে ওনাদের কথোপকথন উৎকর্ণ হয়ে শুনি।)

শঙ্খ ঘোষ : (স্বর্গোদ্যানের অতিথিনিবাসের একটি ঘরে আরামকেদারায় হেলান দিয়ে স্বগতকথনে মগ্ন) :

একটা বৃত্ত বুঝি শেষ হল। শেষ হল কি? নাকি শুরু? ভবিষ্যতই এর উত্তর দেবে। জানি না ভবিষ্যতের পাঠক আমার কবিতা পড়বে কিনা! পড়লেও কীভাবে পড়বে? কী হবে তাদের মূল্যায়ন? অবশ্য সেই ভাবনায় মগ্ন থাকার কোনো অর্থ হয় না। আসল তো সময়। সময়ই এর উত্তর দেবে। আপাতত তাই এই চিন্তায় ছেদ টানি। আমার আত্মা নশ্বর শরীর ছেড়ে অজানা লোকে এসে পৌঁছেছে কয়েকদিন হল। এসে যাদের সঙ্গে প্রথম দেখা তারা হল আলোক ও অলোকরঞ্জন। দুজনে মনের সুখে অপ্সরাদের নৃত্যগীত দেখছিল। তারপর একে একে শক্তি, অশ্রু, নীরেনদা, সুনীল, উৎপল, সৌমিত্র, দেবেশ, সুধীর, নবনীতা, উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের সঙ্গে দেখা। ফলে সময়টা ভলোই কাটছে। কে জানত আশ্চর্য করোনা রোগে আমাকে ছাড়তে হবে মধুময় পৃথিবীর ধূলি!

প্রথমটায় বেশ মুষড়ে পড়েছিলাম। এখন পুরনো বন্ধু, চেনা মানুষগুলোর সঙ্গে মিলতে পেরে ভালোই লাগছে। অলোক, অশ্রু, দেবেশ মিলে ঠিক করেছে আমাদের আড্ডায় আজ আমার কবিপ্রতিভা নিয়ে কথা হবে। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। আমার নিজের ঢাক পেটানো ঘোরতর অপছন্দের। কিন্তু অলোকরঞ্জন, দেবেশ, অশ্রুকে কে উপেক্ষা করবে? ঐ ওরা সকলেই এসে পড়েছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : শঙ্খদা সকলেই উপস্থিত এই প্রণত অপরাহ্ণ বেলায়। বসন্তের নন্দন কাননের শোভা অপূর্ব! এমন পরিবেশে আড্ডা দিতে পারলে বুদ্ধদেব, অশোক মিত্র, নরেশ-দারাও পুলকিত হবেন। যাইহোক আপনিই শুরু করুন। আপনার জবানিতেই শুরু হোক যবনিকা উন্মোচনের চ্যালেঞ্জসঞ্চারী অধ্যায়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় : হ্যাঁ, শুরু করুন।

নবনীতা দেবসেন : জানেন তো আমি চলি শঙ্খদা আপনার আর অলোকদার খুঁট ধরে। শুরু করুন। তারপর, আমি তো ফোড়ন দেবই!

শঙ্খ ঘোষ : কী আর করা যায়। গলাটা এখনো বসে আছে। তবু কিছু বলছি। নবনীতা, শক্তি একটু চুপ করে শোনো :

সেই কবে কৈশোর বেলায় নিভৃতে আমার কবিতা রচনার শুরু। স্বপ্ন দেখতাম কবি হব। ভাবতাম আমার তো কিছু বলার আছে। সেই বক্তব্য বলব কীভাবে? অন্য কোনো পথ আমার জানা ছিল না। অগত্যা কলম ধরতেই হল। শুরু হল কবিতার জন্য রাত জাগা। তখনকার দিনে পরিচয় ছিল সবচেয়ে সাড়া জাগানো পত্রিকা। কে ছিলেন না সেখানে? সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, চিন্মোহন সেহানবীশ, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, হীরেন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি আরও কত নাম। যাইহোক সেখানে আমার বেশ কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় 'যমুনাবতী' কবিতা। পূর্বে কবিতা ভবনে এক বন্ধু বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা পাঠালেও একটি কবিতাও মনোনীত হয়নি। এরজন্য আর কোনোদিন রাগে, ক্ষোভে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আমি দেখা করিনি। এখন অবশ্য সেসব ভাবলে আফশোশ হয়। যাক সেকথা!

আমি যখন কবিতা জগতে আসি সময়ের বিচারে সেটা ছিল বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশক। এর পূর্বের দুটি দশকের বাংলা কবিতার পরিসর তো ছিল চাঁদের হাট। কে ছিলেন না সেখানে—জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নরেশ গুহ, রাম বসু, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ। ১৯৩২ এখনকার বাংলাদেশের চাঁদপুরে আমার মামার বাড়িতে আমার জন্ম। পিতৃপুরুষের ভিটে অবশ্য বরিশালের বাণরিপাড়া নামক গ্রামে। আমার পিতা দেশভাগের পরে এপার বাংলায় চলে আসেন। এই বঙ্গেই আমার উচ্চশিক্ষা। স্কুলের পড়াশুনা অবশ্য ওপার বাংলায়। দাঙ্গা, দেশভাগ এসবই দেখেছি। দেশভাগ যখন হয় তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর। উদ্‌বাস্তু জীবনের বেদনা, তাদের লড়াই, সুখ-দুঃখের কথা আমার থেকে কে বেশি জানে! তখন বাংলা কবিতা এসবের প্রভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। সুভাষ-দা, মঙ্গলাচরণ, রাম বসু, গোলাম কুদ্দুসের কবিতায় দিনবদলের স্বপ্ন স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। তবে কবিতা সমসাময়িকতার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে হয়ে পড়েছিল বড়ো বেশি মুখর। কবিতা আর স্লোগানের ভেদরেখা মুছে যেতে বসেছিল। এরকম সময়ে উঠে এলাম আমরা, অর্থাৎ পঞ্চাশের কবিরা। এই দশকের প্রথম বাংলা কাব্যগ্রন্থ আলোক সরকারের 'উতল নির্জন' প্রকাশিত হয়১৯৫০ সালে। এই দশকেই অলোকরঞ্জনের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'যৌবনবাউল' (১৯৫৯) প্রকাশিত হয়। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিনগুলি রাতগুলি'ও

এই দশকেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশকাল ১৯৫৬। প্রকাশক ছিল এস রায় অ্যান্ড কোম্পানি। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই দশকের অধিকাংশ কবি মগ্নসুরে কবিতা রচনা করেছেন। অনেকেই বলেন দেশভাগ, উদ্‌বাস্তু সমস্যায় মানুষের জীবন যখন ধ্বস্ত, দুমুঠো ভাতের জন্য মানুষ যখন মিছিল করছে, পুলিশের গুলি খাচ্ছে তখন এঁরা আশ্চর্যজনকভাবে দেশকালকে ভুলে স্বনির্মিত রোমান্টিকতার সীমাস্বর্গে অবস্থান করলেন ; কেউ রচনা করলেন 'স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা', কেউ ঈশ্বরের দুয়ারে প্রণিপাত করলেন। তবে আমি মনে করি এই অভিযোগ পুরোপুরি সত্য নয়। অমিতাভ, তরুণ সান্যাল মানুষের কথাই তো বলেছেন। অলোকের প্রথম কাব্যগ্রন্থেই তো এসেছে প্রান্তিক মানুষের কথা। আমার কবিতা নিয়ে আমি কোনো কথা জীবৎকালে বলতে পছন্দ করতাম না। এখন বলি, দু'ধরনের কবিতা প্রথম থেকেই রচনা করেছি। একদিকে যেমন লিখেছি 'দিনগুলি রাতগুলি'র মতো আত্মনিষ্ঠ কবিতা, অন্যদিকে রচনা করেছি 'যমুনাবতী'র মতো তীব্র সমাজবাস্তবতার কবিতা। আসলে আমি মনে করি দুইয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। অলোকের ভাষায় বলি এক তীব্র যন্ত্রণাসম্ভব আত্মসন্ধানী আমি। এরই তাগিদে কখনো আমার ভিতর দিকে চলা, আবার এরই টানে আমি হয়ে উঠেছি প্রবলভাবে সামাজিক। রচনা করেছি বিস্তারধর্মী কবিতা।

আমি ঠিক কৃত্তিবাসী নই। অথচ কৃত্তিবাসের প্রথম সংখ্যাতেই আমার কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এসম্পর্কে আমার অবশ্য বলা ঠিক হবে না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেশ কয়েক বছর হল স্বর্গের নন্দনকাননে শক্তিসহ সুরা,সংগীত আর কাব্যচর্চায় অলস সময় কাটাচ্ছেন বলে জেনেছি। যাক, ঐ ও আসছে, ওকেই বলি! সুনীল বহুকাল পরে তোমার সঙ্গে দেখা। তা, মর্ত্যের পাঠকদের একটু বলতো তোমার কৃত্তিবাসের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : কৃত্তিবাসের প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যায় শঙ্খ ঘোষের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, এই তথ্য এখন অনেকেরই জানা। কিন্তু এর পেছনে আমাদের অতি তরুণ বয়সের যে আবেগের সঞ্চার ছিল, তা ঠিক লিখেও বোঝানো যায় না। আমরা তরুণ কবিদের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই এবং প্রথম কবিতাটি কার হবে তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়। সমসাময়িক অন্যান্য দু'একজন কবির নামও আলোচনায় উঠে আসে। কিন্তু আমরা বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে শঙ্খ ঘোষের কাছে যাই।

তিনি তখন পরিচয় এবং অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের ও নতুন আঙ্গিকের কবিতা লিখে আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে কবিতা প্রার্থনা করার পর, তিনি একটি কবিতার বদলে তাঁর কবিতা ভর্তি একটি খাতাই দিয়ে দিলেন আমাদের। অপূর্ব সুন্দর মুক্তাক্ষর, কোনো কাটাকুটি নেই। পুরো খাতাটাই আমরা বারবার

পড়ে ফেললাম। এমনকী একথাও আমাদের মনে হয়েছিল যে প্রথম সংখ্যায় তাঁর পুরো খাতাটাই ছাপিয়ে দিলে কেমন হয়? তবে এটা ঠিক যে বাস্তবে এটা সম্ভব নয়, প্রথম সংখ্যায় আমরা নিজেরা কেউ লিখব না? নতুন কবিতার আঙ্গিক ও অভীষ্ট শঙ্খ ঘোষের কবিতাগুলিকেই পরিস্ফুটিত করে। অনেক বিবেচনার পর আমরা তাঁর খাতার দীর্ঘতম কবিতাটি বেছে নিই। সেই কবিতাটির নাম ছিল 'দিনগুলি রাতগুলি'।

অশ্রুকুমার সিকদার : আমরা জানি, শঙ্খ সংহত ভাষার শিল্পী। কিন্তু শঙ্খের প্রথম সংকলনের কবিতাগুলি অবশ্য নিঃশব্দ কবিতা নয়। তার মধ্যে শব্দবিলাস, শব্দের উল্লাস অনেক বেশি। ছন্দ নিয়ে, শব্দ নিয়ে, সে এক তুমুল পরীক্ষার সময়—প্রথম পদক্ষেপের উত্তেজনা, অনিশ্চয়তা, উল্লাস, সবই তার মধ্যে আছে। আর আছে হৃদয়ের মধ্যে ধানে-গানে পরিপূর্ণ বসুধাকে, তার অপার ভালোবাসাকে টেনে নিয়ে আসা।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : প্রথম কাব্যগ্রন্থেই শঙ্খদার মূল প্রবণতা—অর্থাৎ আত্মমগ্নতা এবং সমাজলগ্নতার সহাবস্থান-আমরা লক্ষ করি। এই প্রবণতাই পরবর্তীকালে সংহতরূপ পেয়েছে।

দেবেশ রায় : এখানেই তো স্থান পেয়েছে 'কবর' কবিতাটি। 'দিনগুলি রাতগুলি' কবিতারও আগে লেখা। এখানে রয়েছে আত্মকেন্দ্রিকতাকে দূরে ঠেলে সামাজিক হয়ে ওঠার প্রথম সংকেত :

> নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিয়ো হে পৃথিবী
> আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
> মানুষ হবার জন্য যখন যজ্ঞ হবে, আমার হাড়ে
> অস্ত্র গোড়ো, আমায় কোরো ক্ষমা।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'নিহিত পাতালছায়া' (১৯৬৭)। এখানে শঙ্খদার স্বকীয়তার সন্ধানী এষণা নিজেকে পূর্ণ রূপে আবিষ্কার করেছে। শঙ্খদাও নিশ্চয় এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবেন না।

শঙ্খ ঘোষ : (স্মিত হেসে) তুমি যখন বলছ আমি ভিন্ন মত পোষণ করি এমন সাহস কী আর আমার আছে (আবার স্মিত হাসি)!

আলোক সরকার : 'নিহিত পাতালছায়া' এক কথায় book of utter solitude. 'দিনগুলি রাতগুলি' কাব্যে ব্যক্তি মানুষের স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ দেখে ভালো লেগেছিল, যদিও আবেগ-বিহ্বলতা নিয়ে আমার দ্বিধা ছিল। এই দ্বিধা কেটে গেল যখন 'নিহিত পাতালছায়া' পড়লাম। বলতে দ্বিধা নেই, 'নিহিত পাতালছায়া'র কিছু কবিতা পড়ে আমি শঙ্খ ঘোষের কবিতার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিলুম।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার : একটা কথা বলি, শক্তির সম্ভবত মনে আছে। শঙ্খদার 'আদিম লতাগুল্মময়' বইটি ওই আমাকে পড়তে দিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার